প্রথম আলো
বুধবার, ৮ ফেব্রুয়ারি ২০১২
editorial@prothom-alo.info

একুশের চেতনা একুশের পাণ্ডুলিপি

মুনীর কি-বোর্ড

মোস্তাফা জব্বার

শহীদ মুনীর চৌধুরীকে তাঁর বিখ্যাত *কবর* নাটকের জন্য অমর মনে করা হবে, না বাংলা টাইপরাইটার কি-বোর্ডের জন্য—সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে স্কুলের পাঠ্যবইয়ে *রক্তাক্ত প্রান্তর* পাঠ করা আমার জন্য নিশ্চিত করে জবাব দেওয়া কঠিন হবে। প্রযুক্তি ও বাংলা হরফের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মানুষ হিসেবে আমি বাংলা হরফের জন্য তাঁর টাইপরাইটার কি-বোর্ডের সমতুল্য কোনো উদ্ভাবনের কথা স্মরণ করতে পারি না। অন্যদিকে বাঙালি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লড়াইকে জনগণের সামনে উপস্থাপন করার জন্য *কবর* নাটকের কোনো তুলনা নেই।

২৭ নভেম্বর ১৯২৫ জন্ম নেওয়া ও ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ আলবদরদের হাতে নিহত শহীদ মুনীর চৌধুরী আমার কাছে একজন অসাধারণ শিক্ষক এবং পণ্ডিতও বটে। ইংরেজি, বাংলা ও ভাষাতত্ত্বে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনকারী মুনীর চৌধুরীর কাছে শিক্ষাগ্রহণকারী হিসেবে আমি নিজেকে একদিকে ভাগ্যবান মনে করছি, অন্যদিকে মনে করছি স্বাধীন বাংলাদেশ অবশ্যই তাঁর মুনীর টাইপরাইটার কি-বোর্ডের জন্য সবচেয়ে বেশি ঋণী। ১৯৬৫ সালে আবিষ্কৃত মুনীর কিবোর্ড দিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে যদি অপটিমা মুনির টাইপরাইটার প্রচলিত না হতো, তবে এই দেশে অফিস-আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলিত হতো না। হয়তো এখনো আমরা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার নাম লিখতাম এবং ইংরেজি ব্যবহার করতাম, নয়তো রোমান হরফে বাংলা লিখতাম।

বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলাকে যন্ত্রে ব্যবহার করার জন্য প্রথমে মুদ্রণযন্ত্র ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৭৭৮ সালে হুগলীতে মুদ্রিত হলহেডের বই থেকে বাংলা মুদ্রণের ইতিহাস শুরু হয়। বাংলা টাইপরাইটার প্রবর্তন করে রেমিংটন র‍্যান্ড নামের একটি মার্কিনি কোম্পানি। ইংরেজি টাইপরাইটার তাদের হাতেই জন্ম নেয়। বাংলা টাইপিং সিস্টেমের অভাবে এই টাইপরাইটার দিয়ে লন্ডনের সাপ্তাহিক *জনমত* পত্রিকা ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হতে শুরু করে। বাংলাদেশ ও ভারতে এই যন্ত্র প্রচলিত হলেও রোমান হরফের দাসত্ব থেকে সেই টাইপরাইটার কিবোর্ড মুক্ত হতে পারেনি। ফলে বাংলাদেশে বাংলার জন্য নিজস্ব একটি টাইপরাইটার কিবোর্ড প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। শহীদ মুনীর চৌধুরী সেই প্রয়োজনীয়তাকে মাথায় রেখে ১৯৬৫ সালে বাংলার ম্যানুয়েল কি-বোর্ডের জন্য শব্দের পৌনঃপুনিকতা যাচাই করে প্রথম একটি বিজ্ঞানসম্মত কিবোর্ড প্রণয়ন করেন। তাঁর এই কাজে তাঁকে সহায়তা করে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।

এই কি-বোর্ডের অন্তত তিনটি প্রধান সুবিধা হলো :

ক) কি-বোর্ডের মাত্র ৯২টি বোতাম চেপে কোনো ধরনের প্রোগ্রামিং ছাড়া কমপক্ষে ৪৭৯টি বর্ণ-সংখ্যা-চিহ্ন গ্রাফিক্যালি তৈরি করা একটি দুঃসাধ্য কাজ ছিল। মুনীর কিবোর্ড দিয়ে সে কাজটি পুরোপুরি করতে না পারলেও অনেকাংশেই করা সম্ভব হয়েছে।

খ) মুনীর কি-বোর্ডের আগে টাইপরাইটার হোক আর মুদ্রণযন্ত্র হোক, সর্বত্রই বাংলা বর্ণকে রোমান হরফের সঙ্গে মিল রেখে স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে বাংলা টাইপ করার জন্য রোমান হরফে অভ্যস্ততার পাশাপাশি বাংলা হরফকে রোমান হরফের দাসে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু মুনীর চৌধুরী মনে করেছেন যে, বাংলা টাইপিং মানে রোমান হরফ নয়। বাংলা হরফের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। শব্দে এর হরফের ব্যবহারের নিয়মকানুন ভিন্ন। দুনিয়ার কোনো ভাষাই তার নিজের হরফে টাইপ করার জন্য রোমান কিবোর্ডকে অনুসরণ করেনি। হতে পারে কোনো ভাষা তার নিজের হরফের বদলে রোমান হরফ ব্যবহার করেছে, কিন্তু তার নিজের ভাষা রোমান হরফের নিয়মে টাইপরাইটারে বসিয়ে এর বিজ্ঞানসম্মত সমাধান করতে যায়নি। শহীদ মুনীর চৌধুরী তাঁর কি-বোর্ডে শব্দের পৌনঃপুনিকতা বিচার করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোতাম অনুযায়ী বাংলা বর্ণ স্থাপন করেন। এটি বাংলা বর্ণমালার জন্য প্রথম একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রয়াস। অর্থাৎ এই কিবোর্ড ইংরেজি কিবোর্ডকে অকারণে অনুসরণ করেনি। ইংরেজি বর্ণমালার পিছু পিছু ছুটে বাংলা লেখার গতিকে রোমান হরফের শৃঙ্খলে বন্দী করা হয়নি।

গ) মুনীর চৌধুরীর একটি অসাধারণ প্রয়াস ছিল, কিবোর্ড তৈরি করার নামে তিনি বাংলা হরফের কোনো পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি বলেননি যে টাইপরাইটারে জায়গা হয়নি বলে বাংলা যুক্তাক্ষর ফেলে দাও বা বাংলা বর্ণ কমিয়ে ফেল। কোনো বর্ণকেই তিনি অপ্রয়োজনীয় মনে করেননি। তার মানে তাঁর কিবোর্ড প্রণয়নের নামে ভাষা পরিবর্তনের বুজরকি করা হয়নি।

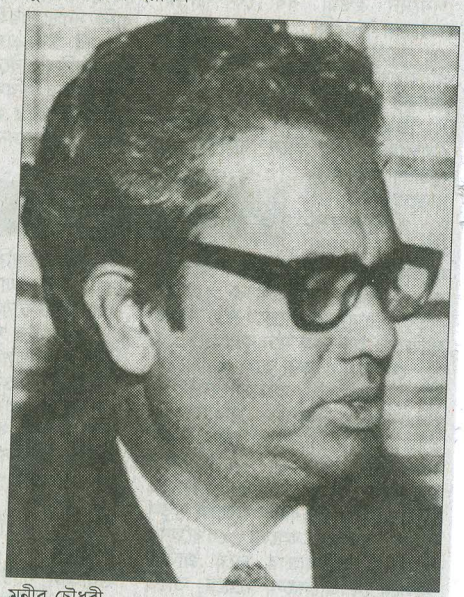

মুনীর চৌধুরী

তবে কেউ যদি এই প্রশ্ন করেন যে এত শ্রেষ্ঠ কিবোর্ডটি কী কারণে আপনি কম্পিউটারের কিবোর্ড হিসেবে গ্রহণ করেননি, তবে এর জবাব হলো—আমি প্রথমে সেই কাজটিই করেছিলাম এবং মুনীর কিবোর্ড অনুসরণ করেই ১৯৮৭ সালে জব্বার কিবোর্ড নামের একটি চার স্তরের কম্পিউটার কিবোর্ড তৈরি করেছিলাম, যাতে মুনীর কি-বোর্ডের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ করা হয়েছিল। পরে যখন এটি উপলব্ধি করলাম যে শহীদ মুনীর চৌধুরী ম্যানুয়াল টাইপরাইটারের যুগে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যা করেছিলেন তার চারটি স্তর কমিয়ে বিজ্ঞানসম্মতভাবেই দুটি স্তরে বিন্যস্ত করা যায় এবং সেজন্য কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ক্ষমতা ব্যবহার করে হাজার হাজার বাংলা হরফও অনায়াসে তৈরি করা যায়, তখন আবার নতুন করে মুনীর চৌধুরীর বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তথা শব্দ ব্যবহারের পৌনঃপুনিকতা যাচাই করে আমি বিজয় কিবোর্ড বিন্যস্ত করি। আমি যদি মুনীর কিবোর্ড অধ্যয়ন না করতাম, যদি আমি তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রয়াসকে অনুভব করতে না পারতাম, তবে বিজয় কি-বোর্ডের জন্ম হতো না। বিশ্বের সব বাংলা ভাষাভাষীর মতো আমিও এই মহামানবের কাছে ঋণী।